Visit http://www.asram.org

ঐশকাজ সম্পাদন বিষয়ক
নির্দেশনামা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ
১৯৯৯

মূলগ্রন্থ	Directorium de Opere Dei persolvendo (Thesaurus Liturgiae Horarum Monasticae) (রোম, ১৯৭৭)
অনুবাদ ও সম্পাদনা	© সাধু বেনেডিক্ট মঠ মহেশ্বরপাশা - খুলনা বাংলাদেশ

প্রথম অংশ

ঐশকাজ সংক্রান্ত ঐশতত্ত্ব

১। বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্যে ঐশকাজের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা

সমস্ত বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্যে ঐশকাজ সম্পাদনকেই সবসময় প্রাধান্য দেওয়া হয়, কেননা ঐশকাজই সন্ন্যাসজীবনের ঘনিষ্ঠতম আধ্যাত্মিকতার উৎস ও সেই জীবন বিন্যাসের জন্য উত্তম উপায়। 'ঐশকাজের আগে কিছুই যেন স্থান না পায়' নিয়মের এই বিধি বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা ও পালন করায় সন্ন্যাসী মণ্ডলীর ধ্রুব ধারণা ব্যক্ত করে যা অনুসারে 'ঈশ্বরের জনগণের প্রকাশ্য ও সমষ্টিগত প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গতভাবেই মণ্ডলীর প্রধান কর্তব্য বলে পরিগণিত, কেননা 'খ্রীষ্টবিশ্বাসী সমষ্টিগত পরিবেশেই প্রার্থনা করতে আহূত।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের উপরোল্লিখিত বাণী শাসনমূলক আদেশ বলে নয়, বরং সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া উচিত যা অনুসারে সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা ও উপাসনা-অনুষ্ঠানকে উচ্চ মর্যাদা দিতেন। কেননা সন্ন্যাসী 'যদি সত্যি ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, যদি ঐশকাজের জন্য আগ্রহ দেখান', তবেই তিনি প্রকাশ করেন যে, তাঁর আহ্বান প্রকৃতই আহ্বান। তিনি সেই 'প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে' প্রবেশ করতে বাসনা করেন যেখানে 'ঐশকাজে রত থাকা' নিঃসন্দেহেই বিশেষ একটা অধিকার; এভাবে তিনি 'তেমন বিশেষ কর্তব্য পালন করেই নিজের ভক্তি দেখান।'

২। ঐশকাজের মাণ্ডলিক দিক

যতবার যে কোন সন্ন্যাস-সঙ্ঘ ঐশকাজ পালনের জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়, ততবার তারা 'বিশিষ্ট ভাবেই প্রার্থনারত মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে দাঁড়ায়: বাস্তবিকই তারা অধিক পূর্ণতর ভাবে মণ্ডলীর আদর্শ ব্যক্ত করে, যে মণ্ডলী এককণ্ঠে প্রভুর অবিরত প্রশংসা করে।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : ঐশকাজের এই মাণ্ডলিক দিক প্রথমত এমনভাবে বিবেচনা করা উচিত নয় তা কেমন যেন এথেকেই উদ্গত হয় যে, সন্ন্যাস সঙ্ঘ মণ্ডলী থেকে পাওয়া 'দায়িত্ব' অনুসারে বা মণ্ডলীর 'নামে' অনুষ্ঠানটি পালন করে; কেননা প্রাহরিক উপাসনা সম্পাদন করার জন্য সম্মিলিত হয়ে—যদিও স্থান ও কালের দিক দিয়ে সীমিত অবস্থায়—সঙ্ঘটা নিজেই প্রকৃত অর্থে 'প্রার্থনারত মণ্ডলী', এবং তার মধ্যে খ্রীষ্টের যাজকীয় অধিকার সত্যিকারে অনুশীলন করা হয় যা মানবমুক্তির ও ঈশ্বরের নিখুঁত গৌরবারোপণের কাজ।' এভাবে প্রার্থনারত একটা বাস্তব সঙ্ঘ ও সার্বজনীন মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্কটা আরও স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। মণ্ডলী থেকে আমরা কেবল উপাসনা-কর্মে পালনীয় সেই নানা বিধিনির্দেশ নয়, প্রার্থনার আসল বাস্তবাতাও পাই যা হল মণ্ডলীর বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ('প্রার্থনার নিয়মই বিশ্বাসের নিয়মকে স্থির করে')। আমরা যদি ঐশকাজ এভাবেই দেখতে চেষ্টা করি, তবে সেই নিন্দনীয় ভুল এড়াতে পারব যা অনুসারে এই উপাসনা-অনুষ্ঠান আড়ম্বর দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও তবু সঙ্ঘের কতিপয় সদস্যদের প্রার্থনাগুলোর মোট সংখ্যা মাত্র বলেই বিবেচিত। সন্ন্যাস-সঙ্ঘ দ্বারা উদ্‌যাপিত প্রাহরিক উপাসনা ব্যক্তিগত প্রার্থনাগুলোর মোট সংখ্যা মাত্র শুধু নয়, কিন্তু তার মাধ্যমে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা প্রকৃত 'প্রার্থনারত মণ্ডলী' রূপেই দাঁড়ান।

৩। 'সহভাগিতার' চিহ্ন

মাণ্ডলিক দিকটা, যা সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ পালনের জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়ে আপন করে নেয়, তা তথাকথিত 'ঊর্ধ্বগামী' সহভাগিতা বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ এমন সহভাগিতা যা প্রাহরিক উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ঈশ্বরের মধ্যে ঘটিত; না, ঈশ্বরের সঙ্গে এই সহভাগিতা কেবল তখনই প্রকৃত ও সত্য যখন তা পার্শ্ববর্তী দিকের অধিকারী, অর্থাৎ ভাইদের মধ্যেই বাস্তবায়িত, এবং সেই অনুসারে, খ্রীষ্টযাগও যেমন, তাও তেমনি সন্ন্যাস-সহভাগিতার চিহ্ন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : যাঁরা ঐশকাজে দেরি করেই যোগ দেন, তাঁদের বেলায় সাধু বেনেডিক্ট এই আদেশ দেন যেন 'তাঁরা প্রার্থনামঞ্চে পদানুক্রমে তাঁদের নির্ধারিত স্থানে না দাঁড়ান', 'সামসঙ্গীত-গানে রত ভাইদের কণ্ঠেও যেন যোগ দিতে সাহস না করেন।' দেখা যাচ্ছে যে এ ব্যবস্থা দু'টোর কারণ হল এই যে, ঐশকাজ পালনের জন্য সঙ্ঘের সকল সদস্যদেরই উপস্থিতি একান্ত দরকার, কেননা উপাসনায় সম্মিলিত মণ্ডলী এক স্থানে জড় হওয়া বহুলোক বোঝায় না, তা বরং সত্যিকারেই হল খ্রীষ্টে সকলের জীবন্তই সহভাগিতা ও তেমন সহভাগিতার চিহ্ন। তাতে অনুমান করা যেতে পারে সন্ন্যাস সঙ্ঘচ্যুতি কেমনতর গুরু দণ্ড বলে গণ্য হয়, কেননা ঐশকাজ 'গোটা মণ্ডলী-দেহেরই ব্যাপার, সেই দেহকে ব্যক্ত করে ও গড়েও তোলে।' বস্তুতপক্ষে সন্ন্যাস সঙ্ঘচ্যুতিতে, নানা অপরাধ অনুযায়ী, হয় ব্যক্তি ঐশকাজের

কোন না কোন দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়, না হয়, প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত সে ঐশকাজে অংশ নেওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্যুত হয়।

৪। ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ

প্রাহরিক উপাসনার অত্যাবশ্যক কাঠামো হল 'ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ', আর যেহেতু আমরা হলাম খ্রীষ্টের অঙ্গ ও ঈশ্বরকে পিতা নামে ডাকতে সাহস করি, সেজন্য—প্রার্থনার প্রাচীন সন্ন্যাসীয় উক্তি অনুসারে—কাঠামোটা হল 'সন্তান ও পিতার মধ্যে সংলাপ।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : ঐশকাজ যাতে সত্যিকারে আত্মিক মূল্য অর্জন করতে পারে এজন্য প্রথমত এ প্রয়োজন যে, সম্পাদনকারীরা প্রত্যেকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে সচেষ্ট থাকবে, প্রতিদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রার্থনা-গভীরেই এগিয়ে চলবে যতক্ষণ না তার প্রকৃত অভিজ্ঞতায় এসে পৌঁছে; অভিজ্ঞতাকে 'ঈশ্বরের নাম স্বীকার করে এমন ওষ্ঠের ফল' বলে (হিব্রু ১৩:১৫) ব্যক্ত করার জন্য এগিয়ে যাবার আগে ব্যক্তি যেন নিজের অন্তরেই তা প্রতিফলিত করে। তারপর এমনটি লক্ষ রাখা উচিত যেন আনুষ্ঠানিক উপাদানগুলো নিজ নিজ মূল্য বজায় রাখে ও সম্পাদন ক্ষেত্রে যেন সংলাপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলো তথা সামসঙ্গীত পরিবেশনে হোক কিংবা সমষ্টিগত ও নীরব মিনতি নিবেদনে হোক বাণীকে শোনা ও বাণীকে সাড়া দেওয়াটা সবসময় অধিক গভীরতর উদ্দীপনায়ই রক্ষিত হয়। ঐশপ্রশংসার ধর্মানুষ্ঠানকে গঠন করে এই আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক উপাদানগুলো যেন কখনও গৌণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করা না হয়, কেননা সম্পাদনকারীর মন-মানসিকতা অনুসারে, ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ক্ষেত্রে (আর ঐশকাজ প্রকৃতপক্ষে তা-ই!), এই উপাদানগুলো হয় সহায়তা করে, না হয় সংলাপে বাধা-বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

৫। পবিত্র নীরবতা পালন

ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপটা যাতে ফলপ্রসূ হয় সতর্কতা রাখা দরকার যেন 'পবিত্র নীরবতার জন্যও উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়।' প্রার্থনারত সঙ্ঘের নীরবতার উদ্দেশ্যই যেন 'পবিত্র আত্মার কণ্ঠের পূর্ণ প্রতিধ্বনি হৃদয়ে গ্রহণ করা হয় ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা যেন ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে ও মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক কণ্ঠের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতর ভাবে সংযুক্ত হয়।' এ নীরবতার সময়ে পবিত্র আত্মা, যাঁকে ব্যতীত কোন খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা হতে পারেই না, 'অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন' ও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে' প্রার্থনাটা উদ্দীপিত করেন' (রো ৮:২৬-২৭)।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : সন্ন্যাস জীবন স্বভাবতই নীরবতা দাবি করে; মঠে-আশ্রমে বাহ্যিক নীরবতা বিরাজ করবে বলা বাহুল্য, এবং সন্ন্যাসীরা আন্তরিক নীরবতা পালন করতে সচেষ্ট; একারণে ঐশকাজে পবিত্র নীরবতা প্রবিষ্ট করানো কম প্রয়োজনই মনে হতে পারে। অথচ বহু মঠ যথেষ্ট উপকারের অভিজ্ঞতা করেছে, এমন উপকার যা বাণী-উপাসনার মধ্যে অর্থাৎ ঐশকাজের মধ্যে নীরবতা-উপাসনা ঢোকানোর ফলেই দেখা দিল; তেমন নীরবতাকে হয় প্রাচীনতম সন্ন্যাসীয় প্রথা অনুসারে এক একটা সামসঙ্গীত শেষে, না হয় পাঠের পরে, আবার শ্লোকের আগে বা পরে স্থান দেওয়া হল। তেমন নীরবতা পালন করার প্রথা সহায়তা দান করে যেন শোনা বাণীকে আপন করা হয়, তার স্বাদ রুচিকর লাগে, সেই বাণী অধিক গভীরেই অন্তরে প্রবেশ করে, এবং শ্রোতার সাড়া-বাণী যেন আত্মায় অধিকতর উদ্দীপনায় পুষ্পিত হয় (দ্রঃ ইসা ৫৫:১০-১১)। 'তথাপি সতর্কতা রাখা দরকার যেন এমন নীরবতা প্রবেশ করানো হয় যা ঐশকাজের কাঠামো বিকৃত, কিংবা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একঘেয়েমি বা বিরক্তির ভাব সৃষ্টি না করে।' এব্যাপারেও সবকিছুতে যেন এমন মাত্রা বজায় রাখা হয় 'যেন সবলের জন্য ইচ্ছা করার কিছু থাকে এবং দুর্বলদের পক্ষে পলায়ন করার মত কিছু না থাকে।'

৬। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ শ্রেয়তর করার ব্যাপারে সন্ন্যাস ঐতিহ্য সেই শিল্পকলায়ই প্রথম স্থান আরোপ করেছে যা গান-বাজনা সংক্রান্ত। এই প্রার্থনার সমস্ত মাধ্যম ও চিহ্নের মধ্যে গান-বাজনার শিল্পকলা এমন উপাদান বিবেচনাযোগ্য হওয়া উচিত নয় যা কেমন যেন বাহির থেকেই প্রার্থনা-পরিবেশে যোগ করা হয়, বরং ঐশপ্রশংসার পুরা ও অধিক ক্রিয়াশীল অংশ বলেই গণ্য হওয়া চাই; তাছাড়া 'সেবিষয়ে একান্ত সুপারিশ করা হয়', প্রথমত একারণে যে, তা হল 'ধর্মানুষ্ঠানের পূর্ণতর আড়ম্বরের চিহ্ন ও ঈশ্বরের প্রশংসা উদ্‌যাপনে সকলের হৃদয়ের গভীরতর একতারও চিহ্ন;' উপরন্তু গানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণীর পূর্ণতর অর্থ অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ পায়; অবশেষে, ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত যে সাড়া, তাও 'প্রার্থনায় রত ও ঈশ্বরের প্রশংসায় রত ব্যক্তির হৃদয়-গভীর থেকেই অধিক উদ্দীপনার সঙ্গে নির্গত হয়।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : উপাসনাকর্মে সঙ্গীত পরিবেশন বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত নয়, কেমন যেন সঙ্গীত নিজে নিজে থেকেই এগিয়ে আসে; সঙ্গীত বরং সবসময়ই বাণী-সেবাকর্মের অধীনে থাকে; এক্ষেত্রে গান-বাজনার ভূমিকা হল এ যে, তা প্রার্থনার অভিব্যক্তির দিক নবীনতর করে তোলে। প্রাচীনকালের ঐতিহ্যগত শিল্পকলার ফল সেই যে

সকল সঙ্গীত, তা রক্ষা করার জন্যই যে সন্ন্যাসীরা আহূত এমন নয়, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত গান-বাজনা যেই ধরনের হোক না কেন, উপাসনার বাণী মার্জিতভাবে পরিবেশন করার জন্য ও প্রার্থনারত সঙ্ঘকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করার জন্যই তাঁরা তা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।

৭। বাহ্যিক চিহ্নের ভূমিকা

সন্ন্যাস সঙ্ঘে সমবেত মানুষেরা সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ আত্মা ও দেহেই ঐশকাজে যোগদান করে। দেহের নানা অঙ্গভঙ্গি, এমনকি কণ্ঠও সেই আন্তর ভক্তির চিহ্ন হতে হবে যার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘটি পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে খ্রীষ্ট-রহস্যের উপস্থিতি জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও সচেতনতাপূর্ণ অংশগ্রহণে ব্যক্ত করে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বাহ্যিক উপাদান যেন কার্যকর চিহ্ন হতে পারে এজন্য এ প্রয়োজন রয়েছে যে, সেগুলো এমন মাধ্যম হতে হবে যেগুলো সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতা স্পর্শ করে যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, নির্ধারিত সময়ে প্রার্থনালয়ে একত্রে আসা, তা তো দেওয়া আদেশের প্রতি বাধ্যতার ব্যাপার শুধু নয়, বরং সর্বাপেক্ষা তা হল 'মণ্ডলী হওয়ারই' বাসনার অভিব্যক্তি; উপাসনার বাণী বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই ঘোষণা ও উপস্থাপন করা হয় তথা সেই বাণী যেন শ্রোতাদের হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করে; সামসঙ্গীত এই মর্মেই গান দ্বারা বা আবৃত্তি দ্বারা পরিবেশন করা হয় তথা যেন খ্রীষ্ট দ্বারা উদ্দীপ্ত একটি কণ্ঠের মাধ্যমে সকল মানুষের মিনতি ও প্রশংসা 'আমাদের অন্তরে এসে পৌঁছে; জয়ধ্বনি এমন আন্তরিক উদ্দীপনার প্রতিধ্বনি হতে হবে যা 'সচেতনতাপূর্ণ'; নীরবতা-পালন হল ঐশআত্মায় 'শোনা বাণীকে গভীরতরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাসনা', যেন প্রাণে প্রার্থনা উৎসারিত হয় ও প্রাণ নিজেও যেন শোনা বাণীতে সাড়া দেয়।

ধর্মানুষ্ঠানটি যেন সত্যিকারে এলক্ষ্যে এসে পৌঁছতে পারে, এর জন্য প্রথমত এ দরকার হয় যে, অনুষ্ঠানটি যেন নিজের দিকে নয় বরং ঐশরহস্যেরই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা অন্ধকারময় হবে; দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানটি যেন অবোধগম্য না হয়, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা অনর্থক হবে; তৃতীয়ত, অনুষ্ঠানটি যেন আপনা আপনিই পালিত না হয়, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা যুক্তি-বিরুদ্ধ হবে, এমনকি আত্মা ও জীবন দান করার যে লক্ষ্যে ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত, সেদিকেও অনুষ্ঠানটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

তেমন ভুলত্রুটি এড়িয়ে, ঐশকাজ আদিষ্ট বিধিনিয়ম অনুসারেই পালন করা উচিত বটে, কিন্তু এই বিধি সংক্রান্ত দিক যা অনুষ্ঠানকে সিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করে, তা ধর্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে না; এমনটি হতে পারে যে, ন্যূনতম বিধিনিয়ম অমান্য না করেও ধর্মানুষ্ঠানটি শীতল, বাহ্যিক ও বাইরেই শুধু ভক্তিপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত অনুষ্ঠানের মানব ভঙ্গির উদ্দীপনা বিকৃতই করে। ধর্মানুষ্ঠানটিকে যে বিষয়ের চিহ্ন হতে হয়—এমনকি যে বিষয় তা উৎপন্ন করার কথা—তা শুধু বাণী নির্ভুল উচ্চারণ বা শুধু বিধিনিয়ম পালন দ্বারা নয়, বরং অনুষ্ঠান যেভাবে পালিত তা দ্বারাও অর্জনীয়: অতএব, চালচলনে মহা শালীনতা (তা অবশ্যই বাহ্যিক আড়ম্বর বোঝায় না), মন্থর, শান্ত ও নীরবতাপূর্ণ পরিবেশ, এবং কমপক্ষে প্রধান প্রহরগুলোতেই, সঙ্গীতের সহায়তায় গাম্ভীর্য—এগুলোই প্রকৃত অনুষ্ঠানের লক্ষণ। এবিষয়েও সতর্কতা রাখা দরকার, যেন আমাদের ভক্তির অতিরিক্ত ধারণাময় প্রবণতা ধর্মানুষ্ঠানকে প্রলাপেই পরিণত না করে; উপাসনায় কথাই যে সর্বোত্তম গুরুত্বের চিহ্ন তা সন্দেহের অতীত; কিন্তু তবু যদি কথা অন্য সকল চিহ্ন থেকে, যথা গান-বাজনা, আলো, অঙ্গভঙ্গি, অলঙ্কার ইত্যাদি চিহ্ন থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে ধর্মানুষ্ঠানকে নিম্ন পর্যায়েও নামাতে পারে।

এই সমস্ত চিহ্নের মাধ্যমে উপাসক সঙ্ঘ বিশ্বাসে রোপিত হয়ে এমনটি প্রকাশ করে যে, সে খ্রীষ্ট-রহস্যে যোগদান করছে। সঙ্গীত পরিবেশন, অঙ্গভঙ্গি, কথা উচ্চারণ বা বাণী ঘোষণা করার ভাব—এই সমস্ত কিছু যেন অন্তর থেকেই উদ্গাত সত্য ও উষ্ণতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, আর তা ঘটে সচেতনতাপূর্ণ অংশগ্রহণের ফলে। এমনটি যেন ঘটে যে, আমরা অপরকেও 'খ্রীষ্টের সেই জীবন্ত উপস্থিতির' সহভাগী করতে পারি যা নিজেরা অনুভব করি তাঁর নিজের বাণীতে ও আমাদের সেই সাড়ায় যা তাঁর কাছে অর্পণ করি! 'তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না? আমাদের সঙ্গে থাক, প্রভু!' (লুক ২৪:৩২,২৯)।

৮। সন্ন্যাসীর প্রার্থনা-জীবনে ঐশকাজই প্রভাবপূর্ণ সময়

প্রার্থনার পুরো প্রভাব ঐশকাজে ফুরিয়ে যায় না: 'বাস্তবিকই খ্রীষ্টবিশ্বাসী সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে আহূত বটে, কিন্তু তবু পিতার কাছে নিভৃতে প্রার্থনা করার জন্য তার পক্ষে নিজ কক্ষে প্রবেশ করা দরকার,' এবং সন্ন্যাসীই বিশেষভাবে 'উপুড় হয়ে প্রার্থনা করতে' বাধ্য। তথাপি মঠে ঐশকাজের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করা হয়, এবং—সকলের বিবেচনা অনুসারে—সন্ন্যাসীর প্রার্থনা-জীবনে ঐশকাজ হল প্রভাবপূর্ণই এক সময় যেহেতু তা হল খ্রীষ্ট-রহস্যই সংক্রান্ত ধর্মানুষ্ঠান যা গোটা সঙ্ঘ দ্বারা পালিত ও ঐশবাণী শ্রবণে ও মিনতি-নিবেদনের মাধ্যমে ঐশবাণীকে সাড়া দেওয়ায় সাধিত।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যেহেতু ঐশকাজ হল প্রার্থনার প্রভাবপূর্ণ সময়, সেজন্য তা প্রথমত ঈশ্বরের সঙ্গে সদা জীবনপূর্ণতর সংযোগ সৃষ্টি করে যিনি ইতিমধ্যেই সঙ্ঘে উপস্থিত, কিন্তু সর্বাপেক্ষা পরিত্রাণ-রহস্যের সঙ্গে এক বিশেষ পন্থা অনুসারে সংযোগ সৃষ্টি করে যা ঈশ্বর সেই সঙ্ঘের জন্য স্থির করেছেন। তাছাড়া ঐশকাজ সর্বোচ্চ

পর্যায়ে সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সহভাগিতা ব্যক্ত করে যেহেতু কণ্ঠ ও মনের সেই 'একমন' (মথি ১৮:১৯) গড়ে তোলে যা দ্বারা ঐশকাজ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রার্থনার মঙ্গলময় সাড়া অর্জন করে; তা করে সেই খ্রীষ্টেরই গুণে যিনি সঙ্ঘের মাঝে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করেন (মথি ১৮:২০)। অবশেষে ঐশকাজ প্রত্যেকজন সন্ন্যাসীকে 'ঐশঅনুগ্রহের প্রেরণার' প্রতি মন উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত করে, সে যেন 'অশ্রু ফেলে ও হৃদয়-ভরা ভক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থনা' করতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যে সংলাপ সে সঙ্ঘে শুরু করেছিল, তা যেন বিলম্বিত করতে পারে।

৯। ঐশকাজের প্রহরগুলোর অর্থ

ঐশকাজের প্রহরগুলো নানা নানা ভিন্ন ভিন্ন কাল বলে বিবেচনাযোগ্য নয়; প্রহরগুলো বরং এমন নানা কাল যা উপাসনার মধ্য দিয়ে উপযুক্তভাবে পরিত্রাণ-ইতিহাসের ক্ষণেই পরিণত হয় যেন আমরা ঈশ্বরের দিকে ছুটে যাবার সুযোগ পাই।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজের প্রহরগুলো হল এমন সময় যা ঈশ্বর আমাদের মঞ্জুর করেন (লুক ১৯:৪৪) আমরা যেন তাঁর দিকে ছুটে চলি এবং তিনি নিজে যেন আমাদের অন্তরে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারেন (মার্ক ১:১৫)। প্রহরগুলো হল খ্রীষ্টের সময় (মথি ২৬:১৮; যোহন ৭:৬,৮) যা যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে আমাদের সেই 'ক্ষণে' (যোহন ২:৪; ৭:৩০ ও অন্যত্র) স্থাপন করে, যে ক্ষণে প্রভু সেই পাস্কা-উত্তরণ সাধন করলেন (যোহন ১৩:১), যে উত্তরণে তিনি প্রতিশ্রুত পরিত্রাণকর্ম সিদ্ধ করলেন ও সবসময়ের মত সিদ্ধ করে যাবেন। ঐশকাজের গোটা প্রহর হল খ্রীষ্টের সেই ক্ষণ যা সঙ্ঘ দিনের মধ্যে নানা সময়ে নিজের মানব-কালে অনুপ্রবিষ্ট করায় যেন পিতার কাছে 'আত্মা ও সত্যের শরণে' (যোহন ৪:২৩) সেই উপাসনা অর্পণ করতে পারে খ্রীষ্টের সেই ক্ষণই যার মূল-উৎস।

একথা যেন স্পষ্ট হয় যে, ঐশকাজ নানা প্রহরে ভাগ ভাগ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিনকে এমন নানা কালে বিভক্ত করা যাতে সেগুলো সব মিলে উপাসনার পরিমাণ কাল মেটায়, বরং উদ্দেশ্যটা হল, সেই নানা কাল যেন প্রার্থনার উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই করা হয়। প্রার্থনার উদ্দেশে নির্ধারিত কাল পবিত্রীকৃত করা দরকার সন্দেহের অতীত, কেননা যেমনটি উচিত সেই অনুসারে 'সর্বদা প্রার্থনা করা' (লুক ১৮:১), তা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এজন্যই আমরা নির্ধারিত নানা সময়েই প্রার্থনা করি।

১০। খ্রীষ্ট-রহস্যের স্মারক অনুষ্ঠান

ঐশকাজ এমন প্রার্থনা যা অন্য সকল প্রার্থনার উর্ধ্বে, আর সেই অনুসারে অন্য সকল ধরনের প্রার্থনা থেকে ভিন্ন, কেননা তার প্রকৃত স্বরূপ হল খ্রীষ্টরহস্য-উদ্‌যাপন করা। খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ ঐশকাজও খ্রীষ্টযাগের মত 'স্মারক অনুষ্ঠান'; সেই অনুসারে ঐশকাজ কিছু না কিছু স্মরণ করায় শুধু নয়, বরং সেই পরিত্রাণ-ইতিহাসকে বর্তমান করে যার আদি, মাধ্যম ও সমাপ্তি স্বয়ং খ্রীষ্ট। ঈশ্বরের অন্বেষা, যা সন্ন্যাসীর ও তার প্রার্থনার প্রকৃত চিহ্ন, তা এভাবে সর্বোচ্চ কাজ বলে ঘোষিত।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ক) অনন্য সাক্রামেন্ত সেই খ্রীষ্টে, যাঁর মধ্যে মানব পরিত্রাণ সাধিত, প্রার্থনা সবসময়ই ছিল 'পরিত্রাণদায়ী মহাঘটনা', একারণে যে, 'গোটা খ্রীষ্ট সেই মানুষই' সমগ্র মানবের জন্য পিতার কাছে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করেছেন যাতে মানব পিতার সঙ্গে সন্তানসুলভ সংলাপ করতে পারে।

'খ্রীষ্টের নামে' প্রার্থনায় সমবেত মণ্ডলী হিসাবে সন্ন্যাস-সঙ্ঘ আপন প্রভুর উপস্থিতি ভোগ করে (মথি ১৮:২০); এজন্য সন্ন্যাস-সঙ্ঘে 'গোটা-খ্রীষ্ট সেই মানুষ' পুনরায় উপস্থিত, আর এর ফলে সঙ্ঘের উপাসনাধর্মী প্রার্থনা নিজ স্বরূপ অনুসারেই হবে 'পরিত্রাণদায়ী মহাঘটনা'।

খ) যখন খ্রীষ্ট-রহস্য ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনে বাস্তবেই বর্তমান হচ্ছে, তখন তা এজন্যই ঘটে, যেন সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ভক্তির মাধ্যমে সেই রহস্যের সঙ্গে সংযোগ লাভ করতে ও সেই রহস্যের অনুগ্রহে জীবনযাপন করতে পারে।

গ) এক্ষেত্রে খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে এক ধরনের সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে: খ্রীষ্টযাগে 'স্মারক' দিকটা দ্বিবিধ ভাবে অনুধাবিত: প্রথমত, তা কর্ম-সংক্রান্ত ভাবে অনুধাবিত, অর্থাৎ তা হল সেই ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসামূলক ধর্মক্রিয়া যা খ্রীষ্টের আত্মবলিদানে বাস্তবেই বর্তমান—যে আত্মবলিদান বেদির উপরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও যার পরিত্রাণদায়ী মূল্য সার্বজনীন; দ্বিতীয়ত, 'স্মারক' দিকটা কর্তা-সংক্রান্ত ভাবে অনুধাবিত, অন্য কথায়: তা হল ত্রাণকর্তার দেহরক্ত গ্রহণে সাধিত অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিময় সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞানলাভ।

যে ব্যক্তিময় সংযোগ গুণে আমরা রহস্যের স্মারক 'পরিবেশে' প্রবিষ্ট হই, সেই সংযোগই হল আসল মাধ্যম যা দ্বারা ঐশকাজ ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসামূলক ধর্মক্রিয়াটা 'দিনের সেই নানা প্রহরে পরিব্যাপ্ত করে' যেগুলো মানবজীবনের কাঠামো স্বরূপ। তাতে এমনটি ঘটে যে, ঐশকাজ ও খ্রীষ্টযাগের মধ্যে কেমন যেন জোয়ার-ভাটার মত গতি প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ, ঐশকাজ খ্রীষ্টযাগের প্রস্তুতি ও একাধারে তার পরিব্যাপ্তিও হয়ে ওঠে।

যেহেতু ঐশকাজ সত্যিকারেই হল পরিত্রাণ-ইতিহাসের 'স্মারক প্রার্থনা' ও খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে তার আছে উপরোল্লিখিত সেই সাদৃশ্য, সেজন্য খ্রীষ্টযাগের মত ঐশকাজও 'আত্মিক যজ্ঞ' বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

১১। তিনটে কাল-চক্র

যেহেতু ঐশকাজ হল খ্রীষ্টরহস্য-উদ্‌যাপনকরণ, সেজন্য তা পরিত্রাণ-রহস্যকে তার সমস্ত দিক দিয়েই ঘিরে রাখে: তেমন রহস্যে রয়েছে পরিত্রাণ সংবাদ, খ্রীষ্টে তার সিদ্ধি, ও চরমকালীন পূর্ণতালাভ পর্যন্ত মণ্ডলীতেই সেই সিদ্ধির পরিব্যাপ্তি।

সময়-চক্রে এই পরিপূর্ণতা-উদ্‌যাপনটা দিন, সপ্তাহ, বর্ষ এই ত্রিবিধ চক্র অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়; তাই সেই অনন্য 'পাস্কা মহাঘটনা' অর্থাৎ সেই উত্তরণ যা দ্বারা ঈশ্বর খ্রীষ্টে মানুষের মুক্তি সাধন করেছেন, তা সদা নতুনভাবে আবর্তনশীলরূপেই অর্পিত হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উপাসনা-দিবস: ঐশকাজের প্রহরগুলো দিনে দিনে খ্রীষ্ট-রহস্যকে আমাদের সামনে নতুনভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরে। ধর্মীয় রহস্য বা পর্ব যাই হোক না কেন যা কোন এক দিনে পালিত হয়, তার মূলভিত্তি অবশেষে সবসময় 'পাস্কা মহাঘটনায়ই' অবস্থিত। প্রেরিতিক পরম্পরা নামক লেখায় (৪১ ধারা) প্রহরগুলোর প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে হিপলিতুস তা-ই সমর্থন করেন যখন ঘোষণা করেন যে এই সমস্ত প্রহর হল 'সেই সমস্ত কাজের স্মরণ যা খ্রীষ্ট সাধন করেছিলেন।'

উপাসনা-সপ্তাহ: এথেকেই সেই অনন্য খ্রীষ্টরহস্য, অর্থাৎ পাস্কা-রহস্য, সেই নানা ক্ষণে ব্যাপ্ত হয় যা পরবর্তীকালে রহস্যটি আপন করে নিল (আগমনকাল-রহস্যের, খ্রীষ্টজন্ম-রহস্যের ইত্যাদি সপ্তাহ); এথেকেই রহস্যটি সেই বিশেষ দিনে স্থাপিত যে দিনটি, পাস্কা-রহস্যের সেই একতা ও সম্পূর্ণতার কারণে যার অভিজ্ঞতা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ঘটে, 'প্রভুর দিন' উৎকৃষ্ট নামে অভিহিত।

উপাসনা-বর্ষ: যেহেতু উপাসনা-বর্ষ হল সেই মহা 'মুক্তি-বর্ষের' সমন্বয়ন যা খ্রীষ্টে সকল মানব-কাল ঘিরে রাখে (লুক ৪:১৬-২১), সেজন্য বর্ষটি পাস্কা মহাঘটনার উদ্‌যাপন ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এই অনুষ্ঠান সম্পাদনে, যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মারক দিবস হিসাবে রবিবারকেই কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে ব্যাপ্ত হয়, সেই উপাসনা-পর্বগুলো আবির্ভূত হয় যেগুলোতে বিশেষভাবেই পরিত্রাণ-রহস্যের নানা দিক স্মরণ করা হয়, তথা: প্রথমত, প্রভুর পাস্কা; তারপর, খ্রীষ্টের জন্ম; উভয় পর্বের আগে এমন কাল যাপিত যা পর্বের প্রস্তুতিকাল, এবং উভয় পর্বের পরে এমন কাল যাপিত যাতে পর্বটি প্রসারিত। খ্রীষ্ট-রহস্যের সঙ্গে সাক্ষ্যমর ও অন্যান্য সাধুসাধ্বীর সেই সমস্ত স্মরণদিবস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়, যেগুলো হল ইহলোকে ও স্বর্গলোকে ঈশ্বরের গোটা জনগণের একতার চিহ্ন, ঠিক 'গোটা-খ্রীষ্টেরই' মত যিনি পিতাকে গৌরবান্বিত করেন।

১২। সন্ন্যাস-দিনের চূড়া ও উৎস

'ঐশকাজের আগে কিছুই যেন স্থান না পায়' এই নির্দেশ মেনে নিয়ে মঠে তার অনুষ্ঠান পালন অন্য কোন কাজে বশীভূত হতে হবে না; বরং প্রাহরিক উপাসনাই সন্ন্যাস সঙ্ঘের দিন তার নিজের গতি অনুসারে নিরূপণ করবে, যে গতিতে, ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনের মাধ্যমে, সেই সকল কালের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় যেগুলিতে সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের কাছে ছুটে যেতে পারেন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: কাজ ও ঐশপাঠ দু'টোই যে সন্ন্যাস-জীবনের অত্যাবশ্যক দিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের অন্বেষণ ক'রে ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার অন্বেষণ ক'রে সন্ন্যাসী তাঁর নিজের জীবনের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি (যা বেনেডিক্টীয় জীবনেরও নিজস্ব উৎকৃষ্ট দিক) ঐশকাজেই খুঁজে পান। ঐশকাজে প্রহরগুলো প্রার্থনার গতি দ্বারা সেই দীনতা স্মরণ করায় ও মেটায় যা আমরা অনুভব করি।

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের এ বিধি থেকে একথা ভেসে ওঠে, এমনকি কথাটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে, ঐশকাজ প্রধান গুরুত্বের অধিকার রাখে ও রক্ষা করে, আর তেমন গুরুত্ব পালনেই মঠে দৈনিক যত কাজের বিন্যাস নিরূপিত। যখন সন্ন্যাস জীবন নিরূপিত উপাসনা-পরিবেশে ঈশ্বরান্বেষায়ই অবস্থিত যা নানা জীবন-পরিবেশ পূর্বশর্ত হিসাবে দাবি করে, তখন একথা বলতে হবে যে, যদি মঠের জীবন-বিন্যাসে ঐশকাজেই সবসময় প্রাধান্য দিই ও তার সেই প্রাধান্য রক্ষা করি, তাহলেই আমরা অকপট অন্তরে বেনেডিক্টীয় নিয়মের প্রেরণা-মত চলি।

১৩। ধ্যানধর্মী প্রশংসা

খ্রীষ্টরহস্য-স্মরণ, অর্থাৎ ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনের বিষয়টা প্রার্থনারত সঙ্ঘে ধ্যানধর্মী প্রশংসা জাগিয়ে তোলার কথা; আর তেমন ধ্যানধর্মী প্রশংসা মনের প্রধান ও মৌলিক অভ্যাস হওয়া চাই।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উষালগ্নে সঙ্ঘে সম্মিলিত সন্ন্যাসীদের হৃদয় থেকে প্রার্থনার যে প্রথম গতি জেগে ওঠে, তা হল প্রভুর প্রতি একটা মিনতি তিনি যেন 'তাঁর প্রশংসা প্রচারের জন্য আমাদের ওষ্ঠ খুলে দেন।' খ্রীষ্টযাগের মত ঐশকাজও 'ধন্যবাদ-স্তুতি' হতে চায়, অর্থাৎ প্রভুর কাছে নিবেদিত ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসা সেই সকল আশ্চর্য কাজের জন্য যা তিনি আমাদের প্রতি দয়াগুণে সাধন করেন ও যা আমরা তাঁর রহস্যে দর্শন করি। ঐশকাজে আমরা সেই প্রশংসাগানের 'প্রভাবপূর্ণ সময়ে' প্রবেশ করার অভিজ্ঞতা লাভ করি যার দিকে পিতা খ্রীষ্টে আমাদের আহ্বান

করেন: 'তাঁর মধ্যে (অর্থাৎ খ্রীষ্টের মধ্যে) আমরাও আহূত হয়েছি ও পূর্বনিরূপিত হয়েছি যেন তাঁর গৌরবের প্রশংসায় দাঁড়াই' (এফে ১:১১-১২, লাতিন পাঠ)।

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে ঐশকাজের সেই গঠনমূলক ভূমিকা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত যা পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা সাধিত (সাম ১১৯:১৬৪), এবং এবিধি জারীকৃত হয়, আমরা যেন 'সেই বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের স্রষ্টাকে তাঁর ন্যায্য বিচারগুলির জন্য প্রশংসা করি।' তাছাড়া নিয়মে এবিধিও জারীকৃত যাতে 'প্রশংসা' সামসঙ্গীতমালা অর্থাৎ সামসঙ্গীতমালার শেষ তিন সামসঙ্গীত প্রভুর দিনে ও সাধারণ দিনগুলিতে—ফলত প্রতিদিন—প্রভাতী বন্দনা ধর্মানুষ্ঠানে বলা হয়; সন্ন্যাস-সমাবেশে সেই স্বর্গদূতদের উপস্থিতিও স্মরণ করানো হয় যাঁরা ঐশপ্রশংসার প্রধান গায়ক ও স্বরূপে ঈশ্বরের উপাসক; 'তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে প্রশংসার সুরে চিৎকার করে আমরা তো উপাসনায় মহোল্লাসে তাঁদেরই সঙ্গে মিলিত হই'; এই সমস্ত কিছু সুস্পষ্টভাবেই দেখায় যে, সন্ন্যাসীদের পক্ষে ঐশকাজের প্রশংসা-সংক্রান্ত ভূমিকা সর্বোচ্চ গুরুত্বেরই ব্যাপার। সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসাগান করেন শুধু নয়, তাঁরা এবিষয়েও সচেতন যে, তাঁদের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে 'আকাশের নিচে যত সৃষ্টজীবও' প্রভুর নাম স্বীকার করে, এবং সেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে যাঁরা প্রশংসার গায়ক শুধু নন কিন্তু 'তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশের সাধকও', তাঁদের সঙ্গে তাঁরাও সচেষ্ট হন যেন যে কণ্ঠ জাগান সেই কণ্ঠের সঙ্গে মনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক হয়। কেননা কেবল তখনই প্রশংসাটি সূক্ষ্ম হবে যখন 'আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।'

১৪। সেবাকাজ হিসাবে প্রার্থনা

ঐশকাজের মিনতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বিশেষ এক অনুগ্রহদান বলে গণ্য হতে পারে, যা দ্বারা পবিত্র আত্মা সন্ন্যাস সঙ্ঘকে তার স্বকীয় সেবাকাজ মঞ্জুর করেন যা 'খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলার' (এফে ৪:১২) সেবাকাজ, ও যা 'প্রার্থনা সংক্রান্ত সেবাকাজ' বলে অভিহিত হতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: 'স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি অসীম ভালবাসার খাতিরে ··· ও বিশ্বমানবগোষ্ঠীর খাতিরে সন্ন্যাসীরা কেবল ঐশউপাসনায়ই নিবিষ্ট থেকে সকলের সর্বোচ্চ ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হয়ে ··· নিজেদের জন্য ও অন্য সকলের জন্যও তাঁদের নিজেদের যাজকত্ব অনুশীলন করে থাকেন।' তাঁদের প্রার্থনার মাধ্যমে, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা দ্বারা গঠিত তাঁদের জীবনের মাধ্যমেও সেই ভূমিকা প্রকাশ পায় যা তাঁরা মানবজাতির মনপরিবর্তনের জন্য পূরণ করতে পারেন।

ঐশকাজের মাধ্যমে সাধিত 'খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলার' এই সেবাকাজ প্রথমত সঙ্ঘের অভ্যন্তরেই অনুশীলন করা হয়, কেননা যতবার সন্ন্যাস সঙ্ঘ 'প্রার্থনারত মণ্ডলী' বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, ততবার 'খ্রীষ্ট নিজের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা কনে সেই মণ্ডলীকেও সম্মিলিত করেন যে মণ্ডলী তার আপন প্রভুকে ডাকে ও যাঁর মাধ্যমে সনাতন পিতাকে উপাসনার অর্ঘ্য অর্পণ করে;' মণ্ডলীতে 'গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য ··· আত্মায় ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গড়ে ওঠে' (এফে ২:২১, লাতিন পাঠ)। তাছাড়া সঙ্ঘের সীমা অতিক্রম করে এই সেবাকাজ জগতের কল্যাণেও অনুশীলন করা হয়, যে জগৎ মুক্তির প্রত্যাশায় রয়েছে। 'বাস্তবিকই তারা অধিক পূর্ণতর ভাবে মণ্ডলীর আদর্শ ব্যক্ত করে, যে মণ্ডলী এককণ্ঠে প্রভুর অবিরত প্রশংসা করে; আরও, তারা, প্রধানত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই, গোটা খ্রীষ্টের রহস্যময় দেহকে গেঁথে তোলার ও বৃদ্ধিশীল করার ব্যাপারে তাদের "সহযোগী" ভূমিকা পূরণ করে।' সুতরাং শুধু ভ্রাতৃপ্রেমে, আদর্শদানে ও দয়াধর্মে নয়, কিন্তু প্রার্থনায়ও মণ্ডলী-সঙ্ঘটা খ্রীষ্টের কাছে মানবাত্মাকে উপনীত করার মাতৃভূমিকা সত্যিকারে অনুশীলন করে।'

১৫। সন্ন্যাস-আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্বীয় উপাদান হিসাবে ঐশকাজ

ঐশকাজ সন্ন্যাস সঙ্ঘের বিশিষ্ট একটা ধর্মক্রিয়া শুধু নয়, তা বরং সন্ন্যাস আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্বীয় উপাদানও। কেননা ঐশকাজ প্রকৃতপক্ষে এ গুণ দ্বারা চিহ্নিত: (১) বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা, যা উপাসনা-ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিত্রাণ-ইতিহাসের চক্রবর্তী বিন্যাস দ্বারা নিরূপিত; (২) ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও ধ্যানধর্মী আধ্যাত্মিকতা, যা প্রার্থনায় সর্বোচ্চ মাত্রায়ই সাধিত; (৩) সহভাগিতা-আধ্যাত্মিকতা, যা জগতে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে ধাবমান।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা: সন্ন্যাস আহ্বান মূলতই মনপরিবর্তনের শামিল, তথা, 'মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর' (মার্ক ১:১৫); এ মনপরিবর্তন এমন যা সন্ন্যাসী খ্রীষ্টে ও তাঁর পরিত্রাণদায়ী উপস্থিতিতে বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করেই আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত করতে চান।

উপরন্তু, আন্তরিক কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ বিশ্বাসে আপন করা খ্রীষ্ট-রহস্য রহস্যের সেই সকল দিক ঘিরে রাখে যে অনুসারে সেগুলো পরবর্তী ধর্মানুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়। এপথ অনুসরণ করে প্রার্থনারত সঙ্ঘ গোটা খ্রীষ্ট-রহস্যের দিকে তার বাস্তবমুখী বাস্তবতায়—'খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী'—দিনে দিনে উত্তরোত্তর ধাবিত হয়, এবং একইসময়ে ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে সঙ্ঘটি তার নিজের বৃদ্ধিশীলতার গতি খুঁজে পায় যা সেই একই রহস্যের অনুরূপে সঙ্ঘকে অনুরূপ করতে চায়—সেই নানা দিক অনুসারে যা নানা উপাসনা-কাল ও দিন উদ্‌যাপনে যথাক্রম অনুযায়ী পালিত।

ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও ধ্যানধর্মী আধ্যাত্মিকতা : ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে যে মিলন ঐশকাজে শুরু হয় এবং গুপ্ত ও নীরব প্রার্থনায় প্রসারিত হয়, সেই মিলন দ্বারা সন্ন্যাসী প্রভুর সেই গৌরবের দিকে ধাবিত হয় যা মুখোমুখী ভাবে সদা গভীরতরভাবেই দর্শনলাভের যোগ্য, যেপর্যন্ত সে নিজেই দর্শনের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।

সহভাগিতা-আধ্যাত্মিকতা : ঐশকাজের দৈনিক পুনরাবৃত্তি সহভাগিতার প্রকৃত চিহ্ন হবেই না যদি তেমন পুনরাবৃত্তি কেবল ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সময়ে সীমাবদ্ধ ও মঠের অভ্যন্তরে সেই সহভাগিতার সু-অভ্যাস সৃষ্টি করতে অক্ষম যা বেনেডিক্টীয় আধ্যাত্মিকতার অত্যাবশ্যক দিক। কেননা ঐক্যবদ্ধ জীবনের আধ্যাত্মিকতা কিছু নয়, কেবল 'জীবন-সহভাগিতা।' তাই বারবার একথা নিজেদের স্মরণ করাতে হবে যে, ঐশকাজ খ্রীষ্ট-রহস্য উদ্‌যাপনেরই নামান্তর, যা দ্বারা প্রতিদিন নতুন ভাবে আমাদের সামনে 'আমাদের প্রতি সেই ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত যিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন' (১ যোহন ৪:৯)। শুধু এশর্তেই আমরা ঐশকাজে সত্যিকারে ঈশ্বরকে দেখতে পাব অর্থাৎ তাঁর 'ভালবাসার' অভিব্যক্তির পাত্র হতে পারব, যদি ভালবাসার বন্ধনে আমাদের ভাইদের সঙ্গে প্রকৃত সহভাগিতায় সংযুক্ত হই। কেননা কেবল এশর্তেই 'ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন' (১ যোহন ৪:১২)। সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম এই আধ্যাত্মিকতার প্রেরণায় উপচে পড়ে (দ্রঃ উপরে, ৩ নং : সহভাগিতার চিহ্ন)।

১৬। ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক দিকের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া

যদিও ঐশকাজ (অর্থাৎ খ্রীষ্ট-রহস্যের উপস্থিতি) তেমন উচ্চ মর্যাদায় অলঙ্কৃত হয়ে থাকে, তবু তার উদ্‌যাপনটা যদি জীবন্ত ও দৈহিক বাসনার বস্তু না হয় এবং সেই সময়টা যদি সমস্ত দিনের চূড়া বলে গণ্য না হয়, তাহলে মহত্তর কারণে এই সমস্ত কিছু এমন প্রলাপের পর্যায়ে পড়বে যা ততখানি অসার যতখানি ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক দিক ও কাঠামো আড়ম্বরপূর্ণ।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : উপরোল্লিখিত বিপদ কাল্পনিক নয়, অভিজ্ঞতাই এবিষয়ের সাক্ষী! আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধ্যানধর্মী প্রার্থনা সম্প্রসারণের ধাপগুলো ভক্তিকে বলবান করার বাসনা থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল যেহেতু উপাসনা-ধর্মানুষ্ঠান তেমন ভক্তির অভাবীই ছিল। প্রার্থনার 'তাল' যে সবসময় একই ও প্রার্থনায় পুনরাবৃত্ত কথা যে অবিচল, এসব কিছু একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে যদি আন্তরিক উদ্দীপনা নবীনতা না আনে। বিধির প্রতি অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা থেকে উৎপন্ন সেই উদ্বেগ যা প্রার্থনার যোগ্যতা (আমার প্রার্থনা কেমন উত্তম) এর চেয়ে প্রার্থনার পরিমাণ (কতগুলো প্রার্থনা উচ্চারণ করেছি) এর দিকে অধিক লক্ষ রাখে ও বাহ্যিক আকারের নিভৃতে যা গুপ্ত তাতে যতখানি মূল্য আরোপ করে তার চেয়ে অধিক মূল্য বাহ্যিক আকারের উপরেই আরোপ করে, তেমন উদ্বেগও ফাঁপা ভক্তির প্রবণতা সাহায্য করতে পারে, আর এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও মিলিয়ে যায়। ঐশকাজ (ও গোটা উপাসনাও) যেন পূর্ণ কর্মফলতা অর্জন করে, এজন্য 'এ প্রয়োজন যে, ভক্তরা—ফলত সন্ন্যাসীরাও—পবিত্র উপাসনার দিকে সরল অন্তরেই এগিয়ে যাবে, মনকে কণ্ঠের সঙ্গে এক করবে, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টাও অর্পণ করবে, পাছে তারা তেমন অনুগ্রহ বৃথাই গ্রহণ করে।'

খ্রীষ্টের সঙ্গে অবিরত আন্তর সংলাপের সু-অভ্যাস যা সন্ন্যাস সাধনার স্বাভাবিক সু-অভ্যাস হওয়া উচিত, তা-ই সন্ন্যাসীকে প্রকৃতপক্ষে ঐশকাজের নিষ্প্রাণ উদ্‌যাপন থেকে মুক্ত করতে পারবে। তেমন সু-অভ্যাস 'ঐশপাঠের' সঙ্গে ঘনঘন চর্চা থেকেই পুষ্টিলাভ করে : পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের কাছে সম্প্রসারিত যে ঈশ্বরের বাণী, তা ধ্যান করা, তার বিষয়ে তথাকথিত 'জাবর কাটা' সাধনা প্রয়োগ করা ও সেই বাণীর স্বাদ ভোগ করাই 'ঐশপাঠের' উদ্দেশ্য ও তার ফল।

দ্বিতীয় অংশ

ঐশকাজ সম্পাদন

১৭। উপাসনার চিহ্নগুলো ও সেই চিহ্নের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা

সন্ন্যাস সঙ্ঘের সেবাকাজ দ্বারা সম্পাদিত ঐশকাজ হল নানা ক্রিয়াকর্মের সমন্বয় (এখানে দর্শনবিদ্যার ভাষা ব্যবহৃত, যা অনুসারে ক্রিয়াকর্ম বলতে মানুষের ইচ্ছা দ্বারা স্থির করা কর্ম বোঝায়)। তেমন ক্রিয়াকর্মের গুরুত্ব এই যে, তা একটা চিহ্ন যা দ্বারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট-রহস্যের সঙ্গে একটা সংযোগ সৃষ্ট হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: নানা ক্রিয়াকর্মের সমন্বয় হিসাবে যখন ধর্মানুষ্ঠানের গঠন এমন কর্মফলতা নয় যা সত্যিকারে মানবীয় নয়, তখন এ কেমন হতে পারে যে, তা নিজের মধ্যে ঐশ্বরিকই একটা বাস্তবতা ঘিরে রাখে বা পবিত্রতাদানকারী কোন কিছুর চিহ্ন হয়? বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান-সম্পাদন ও তাতে অবস্থানকারী বাস্তবতার মধ্যে সেই সম্বন্ধ বিরাজিত যা অর্থদানকারী চিহ্ন (অর্থাৎ সাক্রামেন্ত) ও সেই বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে যার দিকে চিহ্নটা অঙুলি নির্দেশ করে। ফলত ধর্মানুষ্ঠান-সম্পাদন যদি 'চিহ্ন' না হয়, তাহলে তার মূল্য একেবারে শূন্য। কিন্তু চিহ্ন ও চিহ্ন যার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে এ দু'টোর মধ্যে বাস্তবমুখী সম্বন্ধ ছাড়া মানবীয় অবদানও অর্থাৎ বিবেকও থাকা চাই যার ভূমিকা হল সেই সম্বন্ধের দিকে ছুটে যাওয়া ও চিহ্নের অর্থ উপলব্ধি করা।

এই সমস্ত কিছু উপাসনার বেলায় ঘটে: 'সেটাই প্রকৃত উপাসনা যেটা অন্তরের ব্যাপার হতে, ভক্তদের অন্তরে তার নিজের বাস্তবতা সৃষ্টি করতে, মানুষের বিবেকে গ্রাহ্য হতে ও তার আপন অংশ হতে সক্ষম, … অর্থাৎ এমন উপাসনা যা বাস্তবেই মানুষের হৃদয়ে সিদ্ধ হতে পারে।'

যদি সমবেত সন্ন্যাস সঙ্ঘ নিজের জন্য এমন আত্মিক মনমানসিকতা ধারণ করতে না পারে যা দ্বারা সঙ্ঘটা এবিষয়ে সচেতন যে তারা মণ্ডলী, তাহলে তারা যদি মনে করে যে, তাদের প্রার্থনার কোন মূল্য আছে (ঠিক যেন তাদের প্রার্থনা 'কর্মসম্পাদনকারী মণ্ডলীর কর্ম থেকেই' উদ্গত), তবে তাদের এধারণা ভুলধারণা; কেননা যেখানে মণ্ডলী নেই সেখানে 'প্রার্থনাকারী মণ্ডলী'ও নেই। একই কথা প্রযোজ্য সেই সমস্ত অঙ্গভঙ্গি ক্ষেত্রে যেগুলোর অর্থ স্বভাবত প্রার্থনার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে (উদাহরণ স্বরূপ, ক্রুশের আকারে বাহু উত্তোলন বা প্রসারিত করা)। এই সমস্ত উপাসনা-চিহ্নের কোন মূল্যই থাকে না যদি না সেই চিহ্ন আন্তর প্রেরণা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়।

এসমস্ত কথা থেকে দু'টো নিয়ম অপরিহার্য বলে উৎপন্ন: (১) আমাদের ধর্মানুষ্ঠানাদিতে সেই সকল বাহ্যিক চিহ্নের সংখ্যা যেন কমানো না হয় যা প্রাহরিক উপাসনার প্রকৃতি দ্বারা ইতিমধ্যে যথেষ্টই সংখ্যালঘু; (২) সেই সকল চিহ্নের মূল্য আন্তর প্রেরণা দ্বারা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেই যে প্রেরণা প্রতীকমূলক অর্থদানে চিহ্নগুলোকে সঞ্জীবিত করে ও আপন করে; কেবল এপর্যায়েই সেগুলো 'মানবীয় চিহ্ন' ও ফলত কার্যশক্তিমণ্ডিত চিহ্ন হয়ে উঠবে।

১৮। 'পবিত্র' জনসমাবেশ

ঐশকাজের কর্তব্যই এমন উপাসক জনসমাবেশকে স্থাপন করা যা প্রকৃতিগতভাবে সঙ্ঘের অন্য যে কোন সমাবেশ থেকে ভিন্ন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যখন সঙ্ঘের সকল সভ্য ঐশকাজে অনন্য খ্রীষ্ট-রহস্য উদ্‌যাপন করতে সম্মিলিত হয়, তখন তেমন সম্মিলিত হওয়া থেকে উৎপন্ন সম্মেলন নিজস্ব এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত যে, তা সবসময় সম্মিলিত প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে উচ্চতর আত্মিক একতায় উপনীত করবে; একারণেই তেমন সম্মেলন মঠের অন্য যে কোন সাধারণ সম্মেলনের চেয়ে উচ্চতর ধরনের। নানাকাজ ও দায়িত্ব এবং ফলত ভিন্ন আন্তর অভ্যাসজনিত নিশ্চিত বিচ্ছিন্নতা থেকে সেই একতার দিকে উত্তীর্ণ হওয়া (এমন একতা যা ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য শর্তস্বরূপ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সময়ে গঠিত) তখনই মাত্র সম্ভব হবে যদি আমাদের মন সচেতনতা ও দৃঢ় সদিচ্ছার সঙ্গে সেই বিচ্ছিন্নতা বর্জন করে যাতে সর্বাপেক্ষা আন্তরিকই সেই একতার জন্য পথ প্রস্তুত করা হয়। অতএব মনের পরিশুদ্ধির (ও শান্তিকরণেরও) ক্ষিপ্র ও দৃঢ় প্রক্রিয়া দরকার, অর্থাৎ নীরবতা সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যে নীরবতা পরবর্তীতে সেই কণ্ঠেই ভাঙবে যে কণ্ঠে আমরা একক যীশুকেই চিনব ও খুঁজে পাব।

এই মর্মে উপাসক সঙ্ঘকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, আর তেমন প্রস্তুতি প্রার্থনা ও জীবনের বাকি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে মধ্যবর্তী এক স্থান সৃষ্টি করায়ই ঘটে। তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য—উদাহরণ স্বরূপ—সম্মেলনের একটা সঙ্কেত সহায়তা দান করতে পারে যা অন্যান্য সময়ের মত ঐশকাজ শুরু হওয়ার আগেও দেওয়া যেতে পারে; কিংবা, সেই প্রাচীন প্রথার উপর অবলম্বন করা যেতে পারে যা অনুসারে ধর্মানুষ্ঠানের সময়ের কিছুক্ষণ আগে সকলে নিকটবর্তী এক স্থানে একত্রে সম্মিলিত হয় যাতে সেখানে অপেক্ষা করতে করতে প্রহরটা উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে

নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে; অথবা, অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত যেন সঙ্ঘের সদস্যেরা যদিও একা একা করে সম্মিলিত হয় তবুও ধর্মানুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে নিজেদের মন একাগ্র করে তুলতে পারে।

তথাপি একথা লক্ষণীয় যে, এই 'মধ্যবর্তী স্থান' এমন অর্থে বোঝা উচিত নয় তা যেন আমাদের জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, বরং তা হচ্ছে যেন একটা ছাঁকনির মত যা, সন্ন্যাস জীবনের প্রভাবপূর্ণ সময়ের দিকে অগ্রসর হবার আগে, আমাদের মন পরিশুদ্ধ করবে।

ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দীপনা যেন রক্ষিত হয় সেজন্য এ বিষয়াদি পরামর্শ হিসাবে অর্পণ করা হচ্ছে: (১) সঙ্ঘের মন এবিষয়ে সচেতন রাখা উচিত যেন চিহ্নগুলোর সংখ্যা কমানো না হয় ও সেগুলোকে অর্থশূন্য করা না হয়; (২) যত্ন রাখা উচিত যেন সন্ন্যাসীরা পবিত্র শাস্ত্র ও পিতৃগণ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী হন, যাতে সহজতর ভাবে উপস্থাপিত পাঠগুলো বুঝতে পারেন ও দিব্য বীজের জন্য উত্তম মাটি অর্পণ করতে পারেন; (৩) সঙ্গীত ও ধর্মানুষ্ঠান-রীতি বিষয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়; অবশ্য, এমনটি এড়াতে হবে পাছে ধর্মানুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নমিত হয়।

১৯। প্রাচীন ঐতিহ্য ও নবীন সৃজনশীলতা

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের ৮ম–২০শ অধ্যায়ে যেভাবে লেখা আছে, সেই অনুসারে ঐশকাজের বিন্যাস সুস্পষ্ট একটা সাক্ষী যে, বেনেডিক্টীয় মঠগুলো নিজস্বই এক উপাসনা-ঐতিহ্যের অধিকারী। কথাটা দ্বিবিধ এক বিধির উপর নির্ভর করে, তথা: (১) মঠ স্থানীয় মন্ডলী বলে গণ্য, যেহেতু মঠ তার নিজস্ব দৈনিক প্রাহরিক উপাসনার উপরে গেঁথে তোলা; (২) এই প্রাহরিক উপাসনা বর্তমান কোন উপাসনার প্রতিচ্ছবি শুধু নয়, বরং তার নিজের কাঠামোতে এমন কতগুলো উপাদান প্রতীয়মান যা প্রাচীন (বিশেষভাবে সন্ন্যাসীয়) প্রতিষ্ঠানের পরম্পরাগত ঐতিহ্য থেকে স্বাধীনভাবে তুলে নেওয়া, এবং একইসময় সুযোগ দেওয়া হয় যাতে প্রয়োজনবোধে নবীনতর ব্যবস্থা থেকেও কিছু তুলে নেওয়া যেতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে কাথিড্রাল-বিন্যাসকে যথেষ্ট স্বাধীনতার সঙ্গে নেওয়া হয়; নতুন উপাদান বলে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ঘণ্টা অনুপ্রবিষ্ট, যা প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। নিশিজাগরণীও প্রতিদিন পালিত হয়, অপরদিকে মঠের বাইরে কেবল প্রভুর দিনে, বা সাক্ষ্যমরদের স্মরণদিনে ও কালচতুষ্টয়ী শনিবারেই নিশিজাগরণী পালিত ছিল।

একই বিচক্ষণ স্বাধীনতা এতেই প্রকাশ পায় যে, কতগুলো প্রাচীনতম সন্ন্যাস-প্রথাও আপন করা হয়: উদাহরণ স্বরূপ, জাগরণীতে সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যা, প্রথম ঘণ্টা ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান পালন, প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতিতে আব্বা দ্বারা উচ্চারিত প্রভুর প্রার্থনা। আরও গুরুত্বপূর্ণ নতুনত্ব হল দিনমানের ও নৈশকালীন প্রহরগুলোতে নতুন সামসঙ্গীত-বিন্যাস; অবশেষে ঐশকাজের নানা ঘণ্টায় স্তোত্রের অনুপ্রবেশও উল্লেখযোগ্য।

বাস্তব জীবনের কতিপয় পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য আরও কতগুলো ব্যতিক্রমও মঞ্জুর করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ, সঙ্ঘের কম-বেশি সদস্য-সংখ্যা, শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের পার্থক্য, কাজের প্রয়োজনীয়তা, ভুলজনিত কালের অভাব। অবশেষে সামসঙ্গীত-বিন্যাস অন্যভাবে নিরূপণ করার স্বাধীনতাও উল্লেখযোগ্য, তা ঘটে যখন উপস্থাপিত বিন্যাসটা পছন্দমত নয়।

আজকালে, তেমন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ও একই প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়ে বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসিকতা ঐশকাজের গঠন ক্ষেত্রে এক প্রকার বহুমুখিকতা গ্রহণ করে নেয়, কেননা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দ্বারা অধিক নিশ্চিত যে, তেমন বহুমুখিকতা বেনেডিক্টীয় নিয়ম ও তার ঐতিহ্যের উপরে স্থাপিত প্রার্থনার প্রেরণা ও ধ্যানের ঐক্যের কোন ক্ষতি ঘটায় না।

তাছাড়া সকল মঠে প্রকাশিত হচ্ছে এই বাসনা যেন ঐশকাজকে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নির্দেশাবলি অনুসারে সঞ্জীবিত করা হয়; শেষকালে এই বাসনা বিশেষভাবে দুই দিকের দিকেই ধাবিত। একটা দিক সেই সকল মঠ লক্ষ করে যেগুলো সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে স্থিরীকৃত বিন্যাস মূলত রক্ষা করতে অভিপ্রেত, আর সেই অনুসারে মহাসভার উপাসনা-নবীকরণ দ্বারা জারীকৃত নানা অগ্রাধিকার ও উপাসনা-ইতিহাস দ্বারা প্রস্তাবিত নানা সংস্কার গ্রহণ করে তা ঐশকাজের কাঠামোতে অনুপ্রবিষ্ট করায়। অপরদিকে কতগুলো মঠ রয়েছে যেগুলো, নানা পরিমাপে, পবিত্র উপাসনা বিষয়ক নির্দেশনামা অনুশীলনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জন্য মূলবিধিতে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে মঞ্জুর করা 'সুবিধা-মালা' অবলম্বন করে, এবং ঐশউপাসনা সংক্রান্ত পবিত্র সম্প্রদায়ের মন অনুসারে ঐশকাজের সংস্কারকাজ চালিয়ে যায়; সেই পবিত্র সম্প্রদায় ৮ই জুলাই ১৯৭২ সালের চিঠিতে প্রধান আব্বার কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাব তুলে ধরেছে: 'ঐশকাজ সম্পাদন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো গ্রহণীয়, যাতে করে নিজ নিজ আত্মপরিচয় ও নিজ নিজ বাহ্যিক কর্মকান্ড অনুসারে সকল সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের সেই সাধারণ ভিত্তিতেই নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রাখতে পারে।' এ মঠগুলো সামসঙ্গীত ও পাঠ ক্ষেত্রে এমন বিন্যাস অবলম্বন করেছে যা সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম থেকে ভিন্ন হলেও তবু দৈনিক প্রাহরিক উপাসনা-সম্পাদনকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করে। সকলে একত্রে সম্মিলিত হয়, এবং সেই সমস্ত কিছু রক্ষা করতে অভিপ্রেত যা সন্ন্যাসীয় উপাসনার স্বকীয় উপাদান ও যা ঐশউপাসনা সংক্রান্ত পবিত্র সম্প্রদায় (উপরোল্লিখিত স্থানে) নিরূপণ

করেছে, তথা: 'প্রার্থনা নানা প্রহরে ভাগ ভাগ করেই সম্পাদিত হবে, হবে সঙ্ঘবদ্ধ, হবে যথেষ্ট কালপ্রসারী।' তারা সেই আধ্যাত্মিক দাবিতে সাড়া দিতে চায় যা এ যুগের মনমানসিকতা থেকে উদ্গত, আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকজনের ও সঙ্ঘের বাস্তব চাহিদা-পরিস্থিতিও ভিত্তিহীন বলে বিবেচনা করতে চায় না।

২০। সৃজনশীলতার বাস্তব সীমারেখা

যখন সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের জন্য উপাসক সমাবেশ বলে নিজেকে গঠন করে, তখন বাহ্যিক কাঠামোর দিক দিয়ে ও সেই কাঠামোর নেপথ্যে যা কিছু রয়েছে সেই দিক দিয়েও সে শুরু থেকে বাস্তবে নিরূপিত তার সেই প্রার্থনা গ্রহণ করে নেয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ১৯ নং নির্দেশে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে যখন সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের ব্যাপারে কাঠামো বেছে নেয়, তখন বেছে নেওয়ার পরেই তা বাস্তবায়িত করবে, ঐশকাজ সম্পাদনের সময় নয়। তেমন স্বাধীনতা সন্ন্যাসীরা ব্যক্তিগতভাবে আরও কম পরিমাণে ভোগ করেন যদি না, যে ভূমিকা পালনের জন্য তাঁরা দৈবিৎ ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে দাঁড়ান, সেই ভূমিকা অনুশীলন করেন যথা, উদাহরণ স্বরূপ, উদ্বোধনী অংশে উপযুক্ত বাণী দেন, সার্বজনীন প্রার্থনা চালান ও তার শেষ প্রার্থনা বেছে নেন।

ধর্মানুষ্ঠান একবার শুরু হলে সঙ্ঘটি এই নানা বিধি মেনে নিতে বাধ্য, তথা: (১) সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত নানা উপাদান পালন করবে, অর্থাৎ উপাসনা-কাল অনুযায়ী ধর্মনুষ্ঠানের স্থিরীকৃত ও সেই বিশেষ প্রহরের জন্য জারীকৃত সকল উপাদান পালন করবে; (২) সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত কাঠামো পালন করবে, 'যেন সবসময়ই থাকে শুরুতে স্তোত্র এবং পরপরে সামসঙ্গীতমালা, দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রপাঠ … আর অবশেষে মিনতি-নিবেদন।' প্রার্থনাকারী সঙ্ঘ আগে থেকে যেভাবে প্রার্থনা করবে বলে স্থির করেছে, সেই অনুসারে নিজের চাহিদা পূরণেও সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত কাঠামো পালন করবে: উদাহরণ স্বরূপ, সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যা ও সেগুলোর বিন্যাস, পছন্দমত গান বা আবৃত্তি, একজনমাত্র গায়ক বা গায়কদল, শ্লোক পরিবেশনের ধরন, নানা অঙ্গভঙ্গি যেমন পায়ে দাঁড়ানো, বসা, নতজানু হওয়া, হাত উত্তোলন করা ইত্যাদি।

২১। ধর্মানুষ্ঠানের ত্রিবিধ দিক

নিজের প্রকৃত মূল্য রক্ষার জন্য ঐশকাজ-সম্পাদন এ দাবি রাখে যে, উপাসক সঙ্ঘে যেন সবসময় তিনটে দিক বর্তমান থাকে যেগুলো প্রকৃত যে কোন ধর্মানুষ্ঠানের জন্যও প্রয়োজনীয়, তথা, **মান্ডলিক দিক:** যে সঙ্ঘে মণ্ডলী-রহস্য ঘটে, কাল ও স্থানের জন্য সীমিত সেই সঙ্ঘে এই দিক উপস্থিত; **সঙ্ঘ-দিক:** সকলে এক, তবু এক একজন নিজ নিজ স্থান দখল করে ও নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে; **ব্যক্তি-দিক:** ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাল্পনিক ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে না, বরং এমন মানুষের ক্ষেত্রে যারা তাঁর ভালবাসার পাত্র ও যারা পূর্ণ সচেতন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি-দিকটা হল বাকি দু'টো দিকের ভিত্তি ও সেগুলোর অস্তিত্বের শর্ত, যার ফলে এই দিকটা না থাকলে বাকি দু'টোও মিলিয়ে যায়।

(১) ঐশকাজ-সম্পাদন ব্যক্তি-দিক থেকে তার নিজের অস্তিত্বের কারণেই কার্যশক্তিমণ্ডিত; অন্য কথায়, প্রার্থনারত সঙ্ঘের একজনমাত্র সদস্যের উপস্থিতিও এমন চিহ্ন হওয়া চাই যে, সকলে একে অপরকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে একমন ও একহৃদয়; শুধু একটা প্রার্থনাই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে, আর সেটা হল সেই প্রার্থনা যা কণ্ঠের ঐক্যে প্রাণের ঘনিষ্ঠ মিলন ব্যক্ত করে। (২) ঐশকাজ-সম্পাদন ব্যক্তি-দিক থেকে তার বাস্তব স্বরূপেই কার্যশক্তিমণ্ডিত; এ ঘটে যতবার একজন সন্ন্যাসী পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনায় যোগ দেন ও তাতে এমন ক্রিয়াশীল ভূমিকা নেন যাতে 'আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।'

২২। সকলের কাছে উন্মুক্ত ঐশকাজ-অনুষ্ঠান

যদিও উপাসক সঙ্ঘ বলতে সন্ন্যাসীদেরই নিয়ে গঠিত সঙ্ঘ বোঝায়, তবু তা গন্ডিবদ্ধ সমাজ হতে পারে না; বরং যারা তাতে অংশগ্রহণ করতে ও 'সর্বাপেক্ষা উপাসনা-কর্মে পিতা ঈশ্বরকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করতে শিখতে ইচ্ছুক' তাদের সকলের কাছে উপাসক সঙ্ঘকে নিজেকে উন্মুক্ত করতে হবে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যখন এই ধারা উন্মুক্ততার কথা বলে, তখন এমন উন্মুক্ততা বোঝায় না যা দ্বারা সঙ্ঘটি বাইরের দিক দিয়েই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, বরং এমন উন্মুক্ততার কথা বোঝায় যা দ্বারা বাইরেরই মানুষকে শালীনতার সঙ্গে সঙ্ঘের অভ্যন্তরে গ্রহণ করা হয়।

১। সেটাই সন্ন্যাসীয় উপাসনা-প্রার্থনা, যেটা নিজের গতিশীলতা এমনকি নিজের পরিভাষাও রক্ষা করেও তবু পালকীয় দিক থেকে সুবিধাজনক নতুনত্ব গ্রহণ করতে যত্নবান, যেমনটি এমন মঠের বেলায় সমীচীন যে মঠ নিজের পরিবেশে খামির হতে চায়। তথাপি একথা দ্বারা আমরা যেন না বুঝি যে, সন্ন্যাসীয় প্রার্থনার স্থান সকলের জন্য অবশ্যই ও সবসময় কোন বিচারমান না রেখেই উন্মুক্ত হতে হবে; এব্যাপারে এক একবার বাস্তব অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; এবং কতটুকু উন্মুক্ততা মঞ্জুর করা উচিত তাও এক একবার বিবেচনা-সাপেক্ষ। যাই

হোক, সঙ্ঘটি যেন সবসময় এবিষয়ে সচেতন হয় যে, ঐশকাজ এমনভাবে বিন্যাস করা দরকার যেন যে কেউ ইচ্ছুক সন্ন্যাসীদের সমাবেশে সক্রিয় সহভাগিতায় অংশ নিতে পারে, কেননা ঐশকাজ সত্যকার অর্থেই 'মণ্ডলীর সকলেরই প্রার্থনা।'

২। তাছাড়া সন্ন্যাসীয় উপাসক সঙ্ঘের উন্মুক্ততা এ শর্তও রাখে সঙ্ঘটি যেন সবসময় 'যুগলক্ষণ' মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে, যাতে করে তার নিজের উপাসনা-কর্মে—যা হল বিশ্বপরিত্রাণ-রহস্য উদ্‌যাপন—সঙ্ঘটি যত মানব প্রয়োজনীয়তা ও যত ব্যাপার আপন করতে সক্ষম হয়; বিশেষভাবে সঙ্ঘের পক্ষে সেই সমস্ত ব্যাপারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত যেগুলো স্থান ও কালকেই অধিক স্পর্শ করে, সেই সমস্ত ধারণা ও মনোভাবের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের পন্থী বা তার পরিপন্থী। সন্ন্যাস সঙ্ঘের পক্ষে 'প্রকাশ্য উপাসনা-কর্ম ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের কাছে পৌঁছানো ও সমগ্র জগতের পরিত্রাণের ব্যাপারে অবদান রাখা' কখনও যথেষ্ট হবে না; কিন্তু এতেও সচেষ্ট থাকুক যেন ঐশকাজ এমন সুযোগ হয়ে ওঠে যা দ্বারা যে কেউই যোগ দিতে ও সন্ন্যাসীদের প্রার্থনায় মিলিত হতে পারে। অবশেষে সঙ্ঘের পক্ষে উদ্দীপনার সঙ্গে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করা দরকার যে, ঈশ্বরের বাণী থেকে উৎপন্ন প্রার্থনা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সংযোগ সৃষ্টির জন্য একান্ত মূল্যবান, কেননা তা সদা নতুনভাবেই খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতা করার সুযোগ দান করে।

২৩। ঐশকাজের নানা উপাদানের গুরুত্ব

ঐশকাজের লক্ষ্যই 'ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ' প্রস্তুত করা, আর তেমন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ঐশকাজের কাঠামোতে নানা অংশ নিজ নিজ অবদান রাখে: কতগুলো অংশ এতই প্রয়োজনীয় হয় যে সেগুলো কখনও অনুপস্থিত হলে চলবে না, এমনকি সেগুলো অবিচল বিন্যাসক্রমেই প্রতিষ্ঠিত, যেমন স্তোত্র, সামসঙ্গীতগুলো, মিনতি-নিবেদন; আবার কতগুলো অংশ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধ দিকের কারণেই রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে ঐশকাজের গভীর তাৎপর্যে প্রবেশ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: গৌণ গুরুত্বের উপাদানগুলোর অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে রয়েছে উদ্বোধনী উক্তি (হে প্রভু, খুলে দাও ..., ওগো ঈশ্বর, আমার সাহায্যে এসো) ও বিদায় উক্তি (আসুন, প্রভুকে বলি ধন্য); তারপর পদ, শ্লোক, সম্বোধন বাণী (প্রভু আপনাদের সহায় থাকুন) যা সবগুলোই এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলেও যেতে পারে; অবশেষে রয়েছে ধুয়ো, যেগুলো সামসঙ্গীতের ব্যাখ্যা নির্দেশ করে ও যেগুলোর রাগ-রাগিণী অনুসারে সামসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

তাই একথা সুস্পষ্ট যে, এ উপাদানগুলো হল ঐশকাজের সঙ্ঘবদ্ধ দিকের চিহ্ন ও মাধ্যম, এবং এজন্য এগুলোর গুরুত্ব সেই ভূমিকার উপর নির্ভর করে যা অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে এগুলো ব্যবহৃত। (উদাহরণ স্বরূপ দ্রঃ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৭:৬ যেখানে এনির্দেশ দেওয়া হয় যে, গৌণ প্রহরগুলোতে তখনই মাত্র ধুয়ো যোগ দেওয়া হবে যখন সঙ্ঘটা বড়, কিন্তু সঙ্ঘটা ছোট হলে ধুয়ো বাতিল করা হবে; আবার, ১১:১২তে লেখা আছে, যখন কোন ভুলের কারণে সন্ন্যাসীরা দেরিতেই জাগরণীতে আসেন, তখন 'পাঠগুলি বা শ্লোকগুলি থেকে কিছু কমানো দরকার হবে।'

খ্রীষ্টযাগ ও অন্যান্য সাক্রামেন্ত সম্পাদনে যেমন ঐতিহ্যগত প্রথা, তেমনি ঐশকাজ এমন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দ্বারা শুরু হতে পারে যাতে পরিচালক সঙ্ঘকে স্বাগত-সম্প্রীতি বাণী জানান এবং এরপরে সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে সেই বিশেষ কাল বা পর্বে পালিত ঐশরহস্য ও প্রহরটার বিশেষত্ব স্বল্প কথায় তুলে ধরেন।

অবশেষে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নানা গৌণ উপাদান আসলে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানকে কাল, পর্ব ও প্রহরে পালিত ঐশরহস্যের উপযুক্ত পরিবেশে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখে। তাই সুচিন্তিতভাবে সতর্কতা প্রয়োগ করতে হবে পাছে অধিক সরল ও সূক্ষ্মতর গঠনে ফিরে যাওয়ার অবিবেচিত বাসনার ফলে ধর্মানুষ্ঠানটি এই নানা উপাদান থেকে বঞ্চিত হয় আর ফলত নিম্নতর পর্যায়েই পড়ে।

২৪। ঐশকাজ সম্পাদনে সন্ন্যাসীয় ভাবধারা রক্ষা করা

উপরোক্ত কথা (২০ ধারা) অনস্বীকার্য যে, ঐশকাজ বাস্তবে স্থিরীকৃত বাণী ও গঠন অনুসরণ করেই পালিত হওয়া চাই। তাছাড়া এমনটি করতে হবে যেন ঐশকাজ সম্পাদন ও সম্পাদনকারী সঙ্ঘটা একে অপরকে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। তাতে এমনটি ঘটে যে দু'টোই পরস্পর পরস্পরকে এমনই ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে পাল্লা দেবে যেন একথা বলা যেতে পারে যে, যে কোন সঙ্ঘ তার নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতিই পালন করে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উপাসনা-কর্ম ও উপাসনা-কর্মের সম্পাদনকারী সঙ্ঘের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এব্যাপারে মনোযোগ দিলে তবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সন্ন্যাস সঙ্ঘ সার্বজনীন মণ্ডলীর একটা স্থানীয় অঙ্গ; তাছাড়া উপাসনা-কর্মের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘটিকে প্রার্থনাকারী মণ্ডলীকে গঠন করতে হবে। উপরন্তু মাণ্ডলিক সঙ্ঘও সন্ন্যাসীয় ভাবধারার অধিকারী। এজন্য বেনেডিক্টীয় সঙ্ঘ এই দ্বিবিধ ভাব দ্বারা চিহ্নিত, আর এই দু'টো ভাবের একটাও সে এড়াতে পারে না। তাই কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেনই বা শুরু থেকেই (যেমনটি উপরেও বলেছিলাম) বেনেডিক্টীয় সঙ্ঘ নিজের সন্ন্যাসীয় প্রেরণা অনুসরণ করে এমন উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করল যা কাথিড্রাল মণ্ডলীগুলোর প্রণালী

থেকে ভিন্ন যেহেতু সঙ্ঘটি কতগুলো প্রহর পালন করে যেগুলো কাথিড্রাল মণ্ডলীর প্রণালীতে অনুপস্থিত। একই প্রকারে, যদি আজকের দিনে কোন মঠ এমন প্রাহরিক উপাসনা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে যা রোমীয় প্রণালী অনুযায়ী, তাহলে সেই মঠকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন তা সন্ন্যাসীয় ভাবধারার অনুরূপ হয়।

একই প্রকারে, উপাসনা ক্ষেত্রে নিজের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দাবি করে সন্ন্যাস সঙ্ঘ যেন একথা কখনও ভুলে না যায় যে, যে ঐশকাজ সে সম্পাদন করে, তাকে স্থানীয় ভাবধারা প্রতিবিম্বিত করতে হবে বটে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সন্ন্যাসীয় ভাবধারাই প্রতিবিম্বিত করতে হবে। বাস্তবিকই ঐশকাজ-সম্পাদনকে হতে হবে সঙ্ঘের বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ঐশকাজ সন্ন্যাস-দিবসের অন্য সকল আধ্যাত্মিক মূল্যবান জিনিসের উপরেই প্রধান বলে গণ্য, যেহেতু সঙ্ঘের প্রার্থনার ভাবধারা ধ্যানধর্মী ও প্রশংসামূলক।

এব্যাপারে সতর্কতা রাখা দরকার পাছে এভাবে ক্ষতিকর সেই সম্প্রদায়িকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়, কেননা সঙ্ঘ ও তার উপাসনা-কর্মের মধ্যে যে সুচিন্তিত পরিমাপকাঠি রয়েছে, সেই পরিমাপকাঠি এমনটি দাবি করে; এব্যাপারেও সতর্কতা রাখা দরকার পাছে 'একাত্মতা রক্ষার' অন্বেষা বলতে (আর উক্ত একাত্মতা যে সবসময়ই প্রকৃত একাত্মতা এমন নয়!) সবকিছু আইনের মনোভাব অনুসারেই বিচার করা বোঝায়, ঠিক যেন বলা হত: 'এই যে একটা সঙ্ঘ, সুতরাং একটা ঐশকাজ দেওয়া হোক,' বরং উভয় বিষয়ের জীবন্ত সম্বন্ধেরই কথা বিবেচনা করা হোক যাতে উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন না হয়। এর চেয়ে আরও সুচিন্তিতভাবে বলা উচিত, 'এই যে এই বিশেষ সঙ্ঘ, সুতরাং এই বিশেষ ঐশকাজ দেওয়া হোক।'

২৫। প্রহরের সংখ্যা

দিনমানে সাত প্রহরে ও নৈশ জাগরণীতে সন্ন্যাস-ঐশকাজের বিন্যাসটার উদ্দেশ্য ছিল সেই অক্লান্তিকর, অধ্যবসায়ী ও অবিরত প্রার্থনারই আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখানো, যার উদ্দেশে সন্ন্যাসী তার নিজের ব্রতগ্রহণ গুণে বিশেষভাবে নিবেদিত।

যখন অধ্যাত্ম জীবনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আজকালের ধারণা দৈনিক ঐশকাজ-সম্পাদন ক্ষেত্রে প্রহরের সংখ্যার বিষয়ে ভিন্ন মতের প্রস্তাব করে, তখন এ যেন উপরোক্ত ঐশআজ্ঞা ক্ষতিগ্রস্ত না করে, সন্ন্যাসীদের আগ্রহেরও যেন হ্রাস না ঘটায়। বরং উদ্দেশ্য হল, এপথ দ্বারা, বিধেয় চাহিদার কারণে, উচ্চতর পর্যায়েরই প্রার্থনার জন্য সুযোগ দান করা।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা প্রজ্ঞার সঙ্গে এবিষয়ে (কমপক্ষে পরোক্ষভাবে) স্বীকৃতি দিল যে, আজকালের জীবনাবস্থার দিকে লক্ষ করেই উপাসনা-কর্মের বিন্যাস ব্যবস্থা করতে হবে। মহাসভা 'সেবার পরিমাণ' অর্থাৎ প্রাহরিক উপাসনা-সম্পাদন লঘুভার করায় সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক ধরনের নতুন ভার আরোপ করায় অর্থাৎ তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করায়ই তাই করল। সকলের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, যে যে সমস্যা আজকালে বেশি আলোচনার বিষয়, সেগুলোর মধ্যে পরিমাণ ও যোগ্যতার মধ্যকার সম্পর্কই সকলের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। সাধু বেনেডিক্টের নিয়মটাও (১৮:২২-২৪) সেসময়ই এবিষয় বিচার-বিবেচনা করে যোগ্যতার পক্ষে রায় দিয়ে গেছিল (৯ম অধ্যায়ে, রোমীয় বিন্যাস অনুযায়ী জাগরণীর তুলনায় নিয়ম অনুযায়ী জাগরণী যে কত কম দীর্ঘ তাও লক্ষণীয়: প্রভুর দিনে রোমীয় ব্যবস্থা অনুসারে জাগরণীতে ২৪টা সামসঙ্গীত, অপরদিকে বেনেডিক্টীয় ব্যবস্থা অনুসারে জাগরণীতে ১২টা সামসঙ্গীত ও ৩টে গীতিকা থাকবার কথা)।

প্রার্থনার যোগ্যতা আবৃত্ত সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যার উপরেও নির্ভর করে না, কতগুলো প্রহর পালিত হয় তার উপরেও নির্ভর করে না এ বলা বাহুল্য, বরং মন ও হৃদয়ের মনোভাবই সেই যোগ্যতা চিহ্নিত করে। আর যাতে এই মনোভাবের দাবি পূরণ করা হয় সেজন্য এ দরকার যে, (১) সকলেই যেন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনাকে সঙ্ঘ-জীবনের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট করাতে আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা প্রার্থনা এমন প্রভাবপূর্ণ সময় যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে গিয়ে সমস্ত পরিশ্রম ও সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্যই ছুটে চলে; (২) সকলেই যেন একই দৃঢ়তার সঙ্গে এতে সচেষ্ট থাকে যাতে প্রার্থনা এমন মাধ্যম হয়ে ওঠে যা দ্বারা সঙ্ঘ, যে ঐক্যের প্রতি আহূত, সেই ঐক্যে সুসংবদ্ধ হয়।

তাছাড়া প্রার্থনার যোগ্যতা লক্ষ করাটা এই দাবিও রাখে, যেন ঐশকাজের সঙ্ঘবদ্ধ সম্পাদন এমনভাবেই বিন্যস্ত হয় যাতে সকলেই তার প্রতি নিজেদের তীক্ষ্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও তাতে অংশ নিতে পারে। তা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের কারণেই ঘটে, কেননা প্রৈরিতিক বা বস্তুগত কাজের প্রয়োজনীয়তা বহুবার চাপ দেয়, অর তা ঘটতে পারে 'যদি পরিস্থিতি ও সঙ্ঘের দরিদ্রতা তেমন দাবি রাখে;' সুতরাং দরিদ্র পরিস্থিতি সাক্ষীরূপে আনা হয়, কেননা তেমন পরিশ্রম হল জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। যদি মনে করা হয় যে ঐশকাজের দৈনিক বিন্যাস নানা কাজের প্রয়োজনীয়তার চাপের কারণে অতিরিক্ত হয় (যার ফলে মঠে যাপিত জীবন সংসারে যাপিত জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন), তাহলে দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, সন্ন্যাস জীবন বিশ্বপরিত্রাণ-রহস্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, অর্থাৎ সন্ন্যাস-জীবন হিসাবে তা উচ্চতম মূল্যেরই জীবন বটে, তথাপি একেবারে 'জগতের বাইরে' যাপনেরই যোগ্য জীবন বলে বিবেচনাযোগ্য।

ঐশকাজের সম্পাদনীয় প্রহরগুলো সংখ্যায় কমানো দরকার হলে ও অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হলে দু'টো কথা যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার: (১) সম্পাদনীয় প্রহরগুলোর সংখ্যা কমাতে গিয়ে যে প্রার্থনার জন্য দাতব্য সময়কেও কমাতেই হবে, তা যুক্তিসঙ্গত নয়, প্রার্থনার যোগ্যতাও যে হ্রাস পেতেই হবে, তা আরও যুক্তিহীন। বরং এব্যাপারেই চিন্তা দেওয়া উচিত যে, ঐশকাজের যে কোন অনুষ্ঠান বাহ্যিক সম্পাদন ক্ষেত্রেও হল প্রভাবপূর্ণ সময়, আর তেমন ধর্মানুষ্ঠানে এ এ উপাদান থাকা দরকার: মনোযোগ, শান্তি ও আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ-শ্রবণ, নীরব প্রার্থনায় দীর্ঘ অবস্থান, সঙ্গীত পরিবেশন বৃদ্ধি, অনুষ্ঠানে শ্রেয়তর বিকল্প রূপ আনয়ন ইত্যাদি; (২) প্রহরগুলোর সংক্ষিপ্ত সংখ্যা ক্ষেত্রে যখন যা রক্ষা করা হয়েছে তা বিস্তারিত করার বাসনা হয়, তখন তেমন সঙ্কল্প অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এমনটি যেন কখনও না ঘটে যে দু'টো বা তার বেশিও প্রহর একসঙ্গে যোগ করা হয়, কেননা বিবেক প্রশমিত করার জন্য এও মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কারণ এভাবে করলে পুরো ঐশকাজ আবৃত্তি করার বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, যখন এক অনুষ্ঠানে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা একসঙ্গে যোগ করা হয়, তখন মনে হতে পারে তিনটে প্রহর উদ্‌যাপিত হয়েছে যেগুলো কিন্তু শুধু নামেই আলাদা। তেমন কাজ 'প্রহরগুলোর সত্যতা' রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া মূলনিয়মের অবশ্যই বিরুদ্ধ কাজ; তাছাড়া ঐশকাজ সম্পাদনটা আইনের মনোভাব অনুসারেই বিবেচিত হয়, সম্পাদনটা ঠিক যেন এমন বিধি দ্বারা চেপে দেওয়া কাজ যা পূরণ করা দরকার। এতে যে প্রকৃত লক্ষ্যকে ঐশকাজ তার ভিন্ন ভিন্ন প্রহরগুলো সহ মেনে চলে, সেই লক্ষ্য তথা 'দিনের ও সমগ্র মানব কর্মকাণ্ডের পবিত্রীকরণ' ব্যর্থ হয়।

২৬। প্রধান প্রধান প্রহর

ঐশকাজের প্রহরগুলোর হস্তান্তরিত সংখ্যা রক্ষা করা হোক কিংবা কমানো হোক উভয় ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশের দিকে লক্ষ রাখা দরকার যা দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় জারীকৃত হয়েছিল ও 'প্রাহরিক উপাসনার সাধারণ ভূমিকায়' পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, তথা: 'প্রাতঃকালীন প্রার্থনা হিসাবে প্রভাতী বন্দনা ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা হিসাবে সন্ধ্যারতি, যা বিশ্বমণ্ডলীর মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য অনুসারে দৈনিক ঐশকাজের দ্বিবিধ কবজা, প্রধান প্রহর বলে বিবেচনা করা দরকার আর সেই অনুসারেই সেগুলোকে সম্পাদন করা দরকার।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: এ দু'টো প্রহরের প্রাধান্য এতেই স্থাপিত যে, প্রহর দু'টো 'স্মারক' ভূমিকার অধিকারী, প্রথমটা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের, দ্বিতীয়টা তাঁর মৃত্যুর 'স্মরণ'। এজন্য প্রহর দু'টো খ্রীষ্টযাগের নিকটবর্তী ও খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে এমন ত্রিত্বই বলে দাঁড়ায় যা সন্ন্যাসীর দিনের আধ্যাত্মিক বিন্যাসে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। খ্রীষ্টযাগের প্রতি যে প্রাধান্য স্বীকৃত, প্রহর দু'টো সেই প্রাধান্যের সহভাগী হবে তা একান্ত সমীচীন, অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের দিক দিয়েও তা করা সমীচীন; সেই অনুসারে প্রহর দু'টোও সঙ্গীত পরিবেশনে এবং বিশেষভাবে গোটা সঙ্ঘের সক্রিয় উপস্থিতিতেই চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রভাতী বন্দনা অনুষ্ঠানে 'আলো-উপাসনা' ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠানে 'ধূপ-উপাসনা' যোগ দেওয়া যথেষ্টই মানাবে।

উপরোক্ত প্রহর দু'টো যে প্রাধান্যের অধিকারী তা ন্যায়সঙ্গত বটে, তথাপি সন্ন্যাস ঐতিহ্যে জাগরণী উজ্জ্বলতম প্রহর বলে বিবেচিত সেই চরমকালীন দিকের জন্য যা এই প্রহরের উপরে আরোপিত। জাগরণী অনুষ্ঠানটি বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্য নয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবের জন্যই উৎকৃষ্ট, কেননা এ হল ধ্যানধর্মী, শান্তিপূর্ণ ও যথেষ্ট কালপ্রসারী প্রার্থনা।

২৭। ধর্মানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন

সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সন্ন্যাস সঙ্ঘ, যা স্থায়ী মাণ্ডলিক সঙ্ঘ, নানা ভাবে নিম্নলিখিত বিষয় চিহ্নিত করতে পারে, তথা: (১) মহাপর্ব, পর্ব , স্মরণ ও সাধারণ দিনের অনুষ্ঠানের শ্রেণী; (২) সেই দিনের নানা প্রহর; (৩) কোন না কোন অংশ।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজের যে কোন অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের মূল্যবান ভূমিকা মেনে নিয়ে সন্ন্যাসীরা সঙ্গীতকে বিশেষ যত্নেই পালন করেন, কেননা তা কেমন যেন প্রশংসামূলক-ধ্যানধর্মী অভিব্যক্তির উচ্চতম মাধ্যম যা সর্বাপেক্ষা সন্ন্যাসীয় ধর্মানুষ্ঠানের বিশেষ চিহ্ন। এক একটা উপাসক সঙ্ঘের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে রবিবারে ও পর্বে অনুষ্ঠানের অধিকাংশই গান করা কিংবা উন্নতমানের সঙ্গীত ব্যবহার করা, যেইভাবে মানায়, তা বাঞ্ছনীয়। একই প্রকারে, প্রধান প্রহর দু'টো অর্থাৎ প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতি যদি গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সকলে অনুভব করবে যে সেগুলোই সত্যিকারে সেদিনের ঐশকাজের সর্বোচ্চ গুরুত্বেরই প্রহর।

কতগুলো অংশ রয়েছে যেগুলো স্বভাবতই সঙ্গীত দাবি করে, যথা স্তোত্র, গীতিকা, সামসঙ্গীত। সঙ্গীত পরিবেশনে জয়ধ্বনি, ধুয়ো ও শ্লোকের ভাবও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

২৮। ধর্মানুষ্ঠানের কর্মকর্তা

ঐশকাজ হল প্রার্থনা যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরে সঞ্জাত সংলাপ কণ্ঠের মাধ্যমে সঙ্ঘে প্রকাশ পায়। সঙ্ঘের সদস্যেরাই উপাসনা-অনুষ্ঠানের কর্মকর্তা।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যে কোন ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ হল সঙ্ঘ নিজে; সঙ্ঘটিই উপাসক জনসমাবেশকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাতে নানা কর্মকর্তা অনুষ্ঠানের প্রেরণাদায়ী ভূমিকা অনুশীলন করে। ঐশকাজ-অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একটা তালিকা দেওয়া হোক: জনসমাবেশের পরিচালক: অনুষ্ঠান শুরু করা ও (সমাপ্তি প্রার্থনা দ্বারা) তা শেষ করা তাঁরই ভূমিকা; বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে, যা অধিকাংশ মঠে রক্ষিত হয়ে থাকে, পরিচালনার ভূমিকা আব্বাই অনুশীলন করেন, কিংবা তা অনুশীলন করার জন্য তিনি সাপ্তাহিক পরিচালককে নিযুক্ত করতে পারেন; পাঠক (কিংবা পাঠকগণ): এঁরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে বা অন্যত্র থেকে নেওয়া বাণী পাঠ করে শোনান; গায়ক: এঁরই ভূমিকা গানের মাধ্যমে স্তোত্র, ধুয়ো, পদ, শ্লোক ধরা; সামসঙ্গীত-গায়কেরা (এক একটা দলের জন্য একজন): যখন দুই দল সামসঙ্গীত পরিবেশন করে, তখন এঁরা সামসঙ্গীতটা ধরেন; কিংবা এঁদের একজন সামসঙ্গীতের একটা অংশ আবৃত্তি করেন এবং অপর একজন কিংবা সঙ্ঘটি পরবর্তী অংশ আবৃত্তি করেন; ঘোষক: ইনি উপযুক্ত নির্দেশবাণী ঘোষণা করেন, উদাহরণ স্বরূপ সামসঙ্গীত বা পাঠের আগে যে কোন নির্দেশ; গায়কদল: গায়কদের পরিচালনায় কোন গানের একটা অংশ পরিবেশন করা এঁদেরই ভূমিকা, সমগ্র সঙ্ঘ অপর অংশটা পরিবেশন করবে; অবশেষে, যে জনসমাবেশ একত্র হয় কিংবা সামসঙ্গীত ও গীতিকা দু'ভাগে পরিবেশনের জন্য দুই দলে বিভক্ত হয়, সেই জনসমাবেশই হল উপরোক্ত কর্মকর্তাদের পরিবেশ; তারা ঘোষিত বাণী শুনে তাতে সাড়া দেয়।

ধর্মানুষ্ঠানের সকল কর্মকর্তাদের পক্ষে সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের এ বিধি ধ্যান করা দরকার, তথা: কেউই গান ও পাঠ করতে সাহস করবেন না, তাঁরা ছাড়া যাঁরা একাজ এমনভাবেই সম্পাদন করতে পারেন যার ফলে শ্রোতাদের উপকার হয়।' আর আসলে শ্রোতাদের তখনই উপকার হয় যখন কর্মকর্তা বিনম্রতা, গাম্ভীর্য ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই' নিজ ভূমিকা পালন করেন। পরম্পরাগত ও মঠগুলিতে খুবই প্রচলিত সেই প্রথা যা অনুসারে সকলেই পালাক্রমে নানা ভূমিকা অনুশীলন করে, তা যেন বাতিল হয় যখন ঐশকাজ সম্পাদনে পালনীয় নানা দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা যেন অংশগ্রহণকারীদের উপকার করতে পারেন, এজন্য এ দরকার যে, তাঁরা সেবিষয়ে উত্তম দক্ষতার অধিকারী হবেন।